৮

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক মঙ্গলসমাচার এবং প্রেরণদায়িত্ব

বিশ্ব তথা আমাদের দেশের বাস্তবতার প্রতি খ্রীষ্টমণ্ডলীর কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত ? আজকের চ্যালেঞ্জগুলো সে কিভাবে মোকাবিলা করবে ? এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে জগতকে নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনাই-বা কী ? এ সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়েই এখানে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক মঙ্গলসমাচার ও প্রেরণদায়িত্বের প্রেক্ষাপটে আলোচানা করা হবে। মূলত উদ্দেশ্য হল, খ্রীষ্টীয় শিক্ষার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার এবং জগতের রূপান্তরসাধনে অবদান রাখার লক্ষ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলীর দায়িত্বের উপর আলোকপাত। সার্বজনীন ভাষায় বললে বলা যায়, এর অর্থ হল, আমরা এক নতুন সমাজ গঠনে এবং এইভাবে ঈশ্বরের সকল প্রত্যাশা ও মানুষের যত আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাদানে আমাদের মানবীয় আহ্বানকে আরও ভালমত বুঝার চেষ্টা করব।

খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা আশায় ভরপুর। এ শিক্ষা একই ভাবে অনুপ্রেরণাধর্মী। খ্রীষ্টমণ্ডলী এবং আশা করা যায় সকলে এ ব্যাপারে অবগত যে, সমগ্র মানবতার জন্য একটি ‘সামাজিক মঙ্গলসমাচর’ বা সুসমাচার রয়েছে, আর এই সুসমাচারটি হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরিকল্পনা, অভিপ্রায়, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ! কাজেই, খ্রীষ্টমণ্ডলী একে এই সুসমাচার প্রচারের তার প্রেরণাদয়িত্ব – তার নিজের ভাষায় বলা যায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা – হিসেবে দেখে। ঠিক এ কারণেই আমাদের এ আলোচনার শিরোনাম হচ্ছে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক সুসমাচার এবং প্রেরণদায়িত্ব। যেহেতু এই সুসমাচারের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাদান, তাই আমাদের এখনকার আলোচনার বিষয় হচ্ছে জগতের সঙ্গে সংলাপ ও সংহতি, যা খ্রীষ্টমণ্ডলীর অপর একটি প্রেরণদায়িত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

‘প্রেরণদায়িত্ব’ বা ‘মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য’ প্রদান বা জ্ঞাপনের উপর জোর দেয়, যখন সংলাপ বলতে বুঝায়, গ্রহণ ও শিক্ষা। দর্শনের ভাষায় বললে বলা যায়, সকল ধর্ম ও বিশ্ব মতাদর্শে বিশ্বাসী জনগণের কর্তব্য ও অধিকার মঙ্গলসমাচার প্রচার ও সংলাপ দু-ই। অতএব, এ আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য ও সংলাপের উপর। মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য ও সংলাপ দুস্বটি পরিপূরক বৈশিষ্ট্য যা খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক প্রেরণদায়িত্বের অনেক বেশী প্রদায়ী এবং অনেক বেশী গ্রহণমুখী দিকগুলো তুলে ধরে।

সুতরাং, আলোচনার এ পর্বে আলোকপাত করা হয়েছে মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের কিছু সার্বিক বর্ণনার উপর(১)। এরপর এটা ব্যাখ্যা করে, এই প্রেরণদায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক বা মূলভাবসমূহ : মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য ও সামাজিক মঙ্গলসমাচার(২), উন্নয়নের অধিকার(৩), ন্যায্যতার আহ্বান(৪), মানুষের নিয়তির পূর্ণতাদান (৫), মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য, মুক্তি ও কাঠামোগত পরিবর্তন(৬), দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকার(৭), একটি অভিন্ন মানবসমাজ রচনা(৮), এবং এক নতুন সমাজ গঠন(৯)। এ আলোচনা শেষ হবে মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট সম্পর্কে কিছু কথা দিয়ে, যিনি এই অর্থবহ শিক্ষা, যা লোকদের অন্তরতম বাসনা পূরণ করে, তা নিজ জীবনে প্রয়োগ ও ঘোষণা করেছেন।

১। সার্বিক বর্ণনা

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ভারতীয় বিশপগণ তাদের এ সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন : আমাদের মাতৃভূমির জীবন ও অগ্রগতিতে সর্বাত্মক অবদান রাখার জন্য (খ্রীষ্টমণ্ডলীকে) সক্ষম করে তোলা। সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অবশ্য কর্তব্য জগতে তাদের প্রেরণদায়িত্বের পূর্ণতাদান। প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে সংহতিতে বসবাস করে। তারা সেই ব্যাপক দায়িত্বের জন্য, যেগুলো অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে এবং যেসব সমস্যা আমাদের দেশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে সেগুলোর সমাধানেরও জন্য দায়িত্বশীল। খ্রীষ্টের মত আমরাও সেবা করার জন্য এসেছি, খ্রীষ্টমণ্ডলী – অর্থাৎ সকল বিশ্বাসীবর্গ – অবশ্যই অন্যদের জন্য বেঁচে থাকবে এবং দেশের সেবায় অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। সংহতি ও সেবার মনোভাব, যা সকল নেতৃবর্গ ও বিশ্বাসীগণের মধ্যে গড়ে উঠতে হবে, তা নিয়ে তাকে অবশ্যই পারিপার্শ্বিক জগতের জন্য উন্মুক্ত হতে হবে।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশপগণ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব ভারতীয় সেমিনার থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ঘোষণা করেন যে, পবিত্র আত্মা সম্পর্কে অনেক বেশী গভীর সচেতন হওয়ার পাশাপাশি, সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর প্রয়োজন, যে জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রেরিত হয়েছে সেই জগতে – অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী জগতে – অনেক বেশী সক্রিয় ও নিবেদিত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ। তারা এমনকি আরও উল্লেখ করেন, পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টীয় সমাজগুলিকে দেশের জনগণের নানা সংগ্রামে ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় কর্মরত ঐশ পরিকল্পায় পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য পরিচালনা দান করেন, এবং এগুলিকে সব ধরনের বস্তুগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর আরও দায়িত্ব হল, সকল জাতির মাঝে শান্তি ও একতার আনয়ন ঘটানো। যীশুর আত্মিক প্রেরণা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এই জগতে ঈশ্বরের নবায়ন ও পূর্ণতাদানকারী ক্রিয়ার একটি জীবন্ত চিহ্নে রূপান্তরিত করে। তিনি প্রতিনিয়ত খ্রীষ্টমণ্ডলীতে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাঁর মুক্তিদায়ী প্রেরণকার্য অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সকল জাতির মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য এবং ন্যায্যতা ও শান্তির এক নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্যে সংগ্রামরত আমাদের সমাজে রূপান্তরের খামি হয়ে ওঠার জন্য।... আমাদের অবরুদ্ধকারী, বিচ্ছিন্নকারী প্রতিবন্ধকতাগুলোও পবিত্র আত্মা ভেঙ্গে ফেলেন।

যীশু দীনদরিদ্রদের নিকট সুসমাচার প্রচার করেছেন, আর খ্রীষ্টমণ্ডলী তাঁর প্রেরণকার্যকে এগিয়ে নেয় : জগতের প্রতি তার ঘোষিত বাণী হল, খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রয়ে, ঈশ্বর নিজেই গড়ে তুলেছেন প্রেম ও ন্যায্যতার জন্য সংস্কৃতির ভিত্তি। সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর অভিন্ন কর্তব্য এবং সার্বজনীন দায়িত্ব হল, এই সুসমাচারের শিক্ষা অনুযায়ী বসবাস করা, এর পক্ষে সাক্ষ্যদান করা, এবং এটা প্রচার করা। এ অঞ্চলে খ্রীষ্টানরা সংখ্যালঘু জনসংখ্যা হলেও, তাদের অবশ্যই হয়ে উঠতে হবে পৃথিবীর লবণ এবং সমাজের খামি। কাজেই, দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের ও আমাদের লোকদের একাত্ম করার জন্য কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে মঙ্গলসমাচারের মুক্তিদায়ী প্রেরণদায়িত্ব এ অঞ্চলের মানুষের নিকট পৌঁছে যেতে পারে।

২। মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য এবং সামাজিক সুসমাচার

মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের রয়েছে একটি অপরিহার্য সামাজিক দিক। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনৈক্য মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের পথে একটি অন্তরায় বলে একে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জোর আরোপ করেছেন যে, সকল খ্রীষ্টানকে অবশ্যই সুসমাচার প্রচার করতে হবে। জাতির সেবার মনোভাব নিয়ে সকলে খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রচার করবে এবং তাঁর জীবন তাদের সহ-ভাইদের সঙ্গে সহভাগিতা করবে। এ কারণেই, খ্রীষ্টমণ্ডলী ক্ষুধা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে কর্মসূচীসহ নানা ত্রাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে এত বেশী জড়িত। খ্রীষ্টের জীবন সহভাগিতা করার অর্থের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে একটি "সর্বপরিব্যাপ্ত ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের' জন্য ভারতীয় জনগণের নিকট আবেদনে। প্রেরিতদূত সাধু থমাসের ১৯ শতবার্ষিকীর মূলমন্ত্র ছিল 'আমাদের সহভাগিতার জীবন' – ঈশ্বর ও মানুষের জন্য একটি প্রেমের জীবনই হচ্ছে স্বাধীন ভারতের চেতনার ভিত্তি, যা আনুষ্ঠানিকভাবে

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল... 'এর সকল নাগরিকদের জন্য ন্যায্যতা, মুক্তি ও সমতা নিশ্চিত করার এবং তাদের সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ...'। সুতরাং, সমমনা দলগুলো যদি ভ্রাতৃত্বের এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের মুক্তি ও প্রকৃত প্রগতি আর এক নতুন প্রাণশক্তি জীবনের পূর্ণতারই দিকে আমাদের চালিত করবে।

মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের সামাজিক দিকটির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ঘটেছে এবং সবচেয়ে বেশী জোর পেয়েছে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সহভাগিতায়। প্রথম বাক্যটিই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে। ভারতীয় মণ্ডলী "দেশ ও এর জনমণ্ডলীর সামগ্রিক পরিস্থিতির বাস্তবতার মধ্যে তার মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের দায়িত্বকে দেখা অব্যাহত রেখেছে"। আজকের পরিস্থিতি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বারা এবং অর্থনৈতিক দরিদ্রতা, বৈষম্য ও অন্যায্যতা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার অন্যান্য কারণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বর্তমান পরিস্থিতির এ সকল সমস্যার মধ্যেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর মঙ্গলসমাচারীয় প্রেরণদায়িত্বে নিজেকে নিয়োজন করতে হবে। এ মণ্ডলীর উচিত তার মঙ্গলসমাচারীয় দায়িত্ব-কর্তব্যকে দেশ ও এর জনগণের সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা। এইভাবে, মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের অর্থ সামাজিক যত পরিস্থিতির মানবীয়করণ, টানাপোড়েন ও সংঘাতের নিরসন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্প্রসারণ এবং... সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তর সাধন।

সুতরাং খ্রীষ্টমণ্ডলী জনগণকে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণগত আদর্শে তাদের পছন্দের ভিত্তিতে পরিচালনা দান করবে। তাকে অবশ্যই সে-সব দিকগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেগুলো ঐতিহ্য ও আধুনিকতা দু-ই অনুপ্রাণিত এবং মানব ব্যক্তি ও মানব সমাজের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। খ্রীষ্টমণ্ডলী অবশ্যই বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে সঠিক দিকনির্দেশনা যোগাবে। এই কারণে তাকে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, বিকেন্দ্রিকরণ ও সম্পদ বরাদ্দের এমন একটি নীতির প্রস্তাব করতে হবে, যা সুসমাচারকে জনগণের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যে বিশাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফারাকের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে এবং উন্নতর মানব অবস্থার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টমণ্ডলী একটি আধুনিক ঐতিহ্যের গঠনে অংশগ্রহণ করে, যে ঐতিহ্যে নানা রকমের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংরক্ষিত থাকবে ও উৎকর্ষিত হবে।

সেই একই সহভাগিতায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, মানব সমাজের সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা সম্পন্ন হয়। অগ্রগতি, উন্নয়ন ও আমাদের জগতের ঐক্যসাধনের লক্ষ্যে মানুষ অনেক উপায়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে, যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের উদ্যোগ। তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তারা প্রকাশ ঘটায় হৃদয়ের সেই আমূল পরিবর্তনের ঈশ্বরের দাবির, যা মানব সমাজের পরিবর্তন ও মানব বিবেকের রূপান্তরসাধনের কারণ হয়। এ ধরনের কাজগুলো মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যেরই অংশবিশেষ। সুতরাং এমন কথা কি বলা যায় না যে, সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষ তাদের মুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে ?

১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিতে, বিশপগণ আরও উল্লেখ করেন যে, আজকের প্রেরণদায়িত্বকে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি উন্মুক্ত মনোভাব এবং দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি আত্মোনিয়োজনের মনোভাব বজায় রাখতে হবে। প্রেরণদায়িত্বের মধ্যে থাকাকালে, আমাদের লক্ষ্য হতে হবে হৃদয়ের পরিবর্তন এবং সমাজ তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রূপান্তরসাধন। আন্তধর্মীয় সংলাপের পথসমূহ, দরিদ্রদের মুক্তি, মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধগুলো অনুসারে সমাজের রূপান্তর, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংস্কৃত্যায়ন ও কৃষ্টিসমূহের ধর্মান্তরিতকরণ, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেবাকাজ এবং সৃষ্টির অখণ্ডতার উন্নয়ন এগুলোকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ, গুরুত্বপূর্ণ ও আশু হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রেরণকর্মীগণ (বাণীপ্রচারকগণ) অন্বেষণ করবেন সৃজনশীল, বিশ্বাসযোগ্য, এমনকি অ-প্রাতিষ্ঠানিক ধরনের উপস্থিতি ও সেবাদায়িত্বের। উপরোক্ত আলোচনা থেকে কি এটাই বেরিয়ে আসে না যে, অন্ততপক্ষে বিস্তৃত অর্থে, সুসমাচারের রয়েছে অনেকগুলি দিক, মুখ আর এমনকি সকল ধর্মের বিশ্বাসীগণসহ বার্তাবাহকগণ ?

৩। উন্নয়নের অধিকার

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব বিশপগণের সিনড এবং জগতে ন্যায্যতা নামে প্রকাশিত দলিল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনী উন্নয়ন ও ন্যায্যতার জন্য ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতীয় জনগণের উদ্দেশে একটি আবেগঘন আবেদন প্রকাশ করে। এ আবেদনে তারা উল্লেখ করেন : "আমাদের জনগণ অনেক অন্যায্যতার শিকার; এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর হচ্ছে, তাদের উন্নয়নের অধিকারের বাস্তব অস্বীকৃতি। উন্নয়নকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। প্রকৃত হওয়ার লক্ষ্যে একে অবশ্যই হতে হবে পূর্ণাঙ্গ : সার্বিক, অর্থাৎ, একে প্রতিটি মানুষের ও সমগ্র মানুষের মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হতে হবে। এই লক্ষ্যে, মনুষ্যত্বে বিকশিত হওয়ার জন্য, স্বীয় ব্যক্তিগত মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য, অনেক বেশী ব্যক্তিময় হয়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক মানুষের রয়েছে জন্মগত অধিকার। অথচ বাস্তবে, এই অধিকারের চর্চা লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়। তাই বলা যায়, এখানেই নিহিত রয়েছে মারাত্মক অন্যায্যতা" (১৪, উদ্ধৃত পৃষ্ঠা ১৪-১৫)।

অধিকন্তু, বিশপগণ সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির এবং সকলকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন : "প্রশ্নটা শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের নয়, পাশাপাশি এটা আরও হচ্ছে এ অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিটি নারী-পুরুষের উন্নয়নের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার; আর এর থেকে অনেক গভীর হচ্ছে – বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে দেশের প্রতিটি নাগরিককে স্বীকার করে নেওয়ার প্রশ্ন, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয় কিন্তু আমাদের দেশের জন্য ঈশ্বর যে নিয়তি স্থির করে রেখেছেন, সে দিকে আমাদের জাতিকে চালিত করার যৌথ প্রচেষ্টায় আমাদের সঙ্গী ও একজন সহযোগী হিসেবে" (১৪-১৫)।

বিশপগণ মানবাধিকারের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন এবং সকল সমাজ ও দলগুলিকে সহযোগিতা করার আর উন্নয়ন ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সনির্বন্ধ আহ্বান জানিয়েছেন। উন্নয়নের অধিকারকে অবশ্যই সে সকল মৌলিক মানবাধিকারের প্রাণবন্ত ব্যাখ্যা হিসেবে দেখতে হবে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিবর্গ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিবর্গের নয় কিন্তু বিভিন্ন দলের লক্ষাধিক অধিকার নিয়ে উন্নয়নের অধিকার। এ সকল দলগুলিকেও – হোক সেগুলো একক পরিবার, শিক্ষাগত বা সাংস্কৃতিক সংঘ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পৌর বা রাষ্ট্রীয় দল, ধর্মীয় সমাজ, অথবা এ রকম কোন কিছু – আজকে আমরা একান্ত আবেদন জানাই সকল প্রকার অন্যায্যতার অপসারণে এবং সাধারণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহের সাথে হাতে হাত মেলানোর জন্য... তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন সুযোগ থাকবে না দেশ বা জাতির স্বার্থের উপর প্রাধান্য বিস্তারের। ত্যাগের বিনিময়ে হলেও, সকল দলকে সহযোগিতাকে জোরদার করতে হবে। এটা দাবি করে মিলিত ও যৌথ পর্যায়ে ধর্মীয় প্রণোদনার। এ অঞ্চলের সকল ধর্মগুলোর জন্য সময় এসেছে এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গতিময়তার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার।

৪। ন্যায্যতার আহ্বান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশপগণ সকলের উন্নয়নের অধিকারকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার জনগণের আছে। দরিদ্রতা ও অপুষ্টির ফলাফল অত্যন্ত আশঙ্কাজনকভাবে আমাদের উচ্চ শিশু মৃত্যুহারের কারণ হয়। একইভাবে, পর্যাপ্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার অভাবের কারণে অনেক শিশুদের ক্ষেত্রে জীবনের অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অমানবীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বয়ে আনে অর্থনৈতিক অন্যায্যতা এবং মানবাধিকারের অস্বীকৃতি। কাজেই বিশপগণ ১৯৭৮ ও ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেছেন : দরিদ্রতা, অনাহার ও অপুষ্টি আমাদের দেশীয় ভাইবোনদের জীবনের বৈশিষ্ট্য বিধায় ন্যায্যতার জন্য কাজ করার যে-কোন প্রচেষ্টা অবশ্যই মানুষের অধিকারের অন্তর্গত সর্বাপেক্ষা মৌলিক অধিকারগুলোকে বুঝতে লোকদের যোগ্য করে তোলার মাধ্যমে শুরু হতে হবে। এইভাবে বিশপগণ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নকে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

বিশপগণ ভালবাসা ও ন্যায্যতার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়েও বলেছেন : ভালবাসা ন্যায্যতার চূড়ান্ত দাবিকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ প্রতিবেশীর মর্যাদা ও অধিকারগুলোর

স্বীকৃতি। অতএব, ভালবাসা অন্যায্যতার সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পারে না। একদিকে, আমাদের লোকদের জন্য আমাদের চরম ভালবাসা অবশ্যই অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে অন্যায্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের চালিত করবে। অপরদিকে, ভালবাসার পরিপূর্ণ প্রকাশের দিকে চালিত করবে ন্যায্যতা । একে 'ভালবাসার আন্তরিকতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল অন্য ব্যক্তিদের তাদের সকল সীমাবদ্ধতা এবং তাদের উন্নয়নের সকল সম্ভাবনা সহ গ্রহণ করে নেওয়া।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ আরও উল্লেখ করেছেন : দেশের মধ্যে যারা বৈষম্য ও অন্যায্যতার শিকার তাদের জন্য খ্রীষ্টের ভালবাসাকে বাস্তবরূপ দান করার জন্য খ্রীষ্টীয়সমাজগুলো আহূত হয়েছে বলে মনে করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের নানা আর্থিক সমস্যা এবং অল্প কয়েকজনের ভোগবাদ ও সম্পদের কুক্ষিগতকরণ ব্যাখ্যা করার পর, তারা এ বলে শেষ করেছেন : খ্রীষ্টমণ্ডলী আহূত হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ ক'রে খ্রীষ্টীয় ন্যায্যতার কথা প্রচার করার জন্য। এছাড়াও খ্রীষ্টমণ্ডলী আহূত হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, যেন উন্নয়নের সুফলগুলো সমানভাবে বণ্টিত হয় ও গ্রামীণ অবকাঠামো সৃষ্টি করা হয় তার উপর গুরুত্বারোপ করে খ্রীষ্টীয় ন্যায্যতার কথা প্রচার করার জন্য, যাতে দরিদ্ররা উৎপাদনে তাদের ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে এবং পৃথিবীর সম্পদের আরও বেশী অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের যোগ্য করে তোলার মাধ্যমে নিজেদের সাহায্য করার সুযোগ পায়।

এ ভাবনার রেশ ধরে বিশপগণ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ করেছেন : আমাদের সকল বক্তব্য ও পরামর্শগুলো এটা উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করেছে যে, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণের সিনডের বিবৃতি আজকে অনেক বেশী ন্যায়সঙ্গত ও জরুরী হয়ে পড়েছে। 'ন্যায্যতার পক্ষ থেকে কাজ ও জগতের রূপান্তরসাধনে অংশগ্রহণ, আমাদের সামনে পুরোপুরি আবির্ভূত হয় মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্যের, অথবা, আরেক কথায়, মানবজাতির পরিত্রাণের এবং সব ধরনের পীড়নমূলক পরিস্থিতি থেকে একে মুক্ত করার জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের একটি অপরিহার্য দিক হিসেবে'।

১৯৮৪ খ্রীষ্টের নাগপুর সম্মেলন নবায়িত সংকল্পগুলো সামাজিক ন্যায্যতা ও মানব মুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উত্থাপিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। নতুন গুরুত্বারোপটি এ বর্ধিত সচেতনা প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টমণ্ডলী তার প্রেরণদায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবে না... যদি না সমগ্র ঐশজনগণকে তাদের দরিদ্রতা, বৈষম্য ও নিপীড়নের পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করার লক্ষ্যে লোকদের সক্ষম করে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাণীপ্রচারধর্মী প্রেরণকার্যের একটি অপরিহার্য দিক হিসেবে সামাজিক ন্যায্যতার প্রতিষ্ঠার কথা বিশপগণের সিনডে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ভারতের মত দেশগুলিতে সামাজিক ন্যাযতা প্রতিষ্ঠাকে দেখতে হবে প্রেরণদায়িত্বের একটি বিশেষ প্রকাশ হিসাবে এবং একটি প্রৈরিতিক অগ্রাধিকার হিসেবে।

৫। মানুষের নিয়তির পূর্ণতা

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ ন্যায্যতা ও উন্নয়ন বিষয়ক নীচের এ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন : আজকে মণ্ডলী স্পষ্টতই স্বীকার করে যে, পরিত্রাণ আধ্যাত্মিকতা ও খাঁটি পরকালতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু এর মধ্যে আরও অন্তর্গত মানবব্যক্তি ও সমাজের নবায়ন, মুক্তি এবং পূর্ণতা। অপরদিকে, বস্তুগত সহায়তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন সমতার নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি এগুলো ব্যক্তির জন্য সামগ্রিক পূর্ণতার ও উত্তম সমাজ ব্যবস্থার দিকে চালিত হবে। এটা আরও হতে হবে তৃণমূলপর্যায়ের নানামুখী উদ্যোগ এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি ক'রে। উন্নয়নের এই সাধারণ দর্শনের অর্থ পাপের প্রভাব থেকে, সব ধরনের নিপীড়ন ও অন্যায্যতা থেকে মুক্তি, এমনকি মুক্তি নীতিমালা ও বিভিন্ন কাঠামোর সৃষ্ট সে সকল বিষয় থেকে যেগুলো... ধনী ও গরীবদের মধ্যে ব্যবধানকে স্থায়ী রূপদান করে।

তাহলে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর দায়িত্ব শুধুমাত্র নানা দারিদ্র্য সমস্যা ও অর্থনৈতিক অন্যায্যতার মুখে বস্তুগত অবদান রাখা নয়, কিন্তু উন্নয়ন কাজকে সঠিক দিকনির্দেশনা যোগানোও হচ্ছে এর দায়িত্ব। আত্ম-নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, উন্নয়নকে হয়ে উঠতে হবে লোকদের

তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার একটি কাজ, যারা খাঁটি মানব অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে অংশগ্রহণের একটি কাজ। সর্বোপরি, খ্রীষ্টমণ্ডলীর দায়িত্ব হল, এটা তুলে ধরা যে, বৈষয়িক ও সামাজিক স্তরে মুক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক নিয়তির পূর্ণতা ব্যতীত কখনোই সাধিত হতে পারে না। উন্নয়নধর্মী কর্মকাণ্ডকে অবশেষে সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ও পূর্ণতার দিকে ধাবিত হতে হবে ।

৬। মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য, মুক্তি ও কাঠামোগত পরিবর্তন

বিশপগণ মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য ও সার্বিক মুক্তিকে যুক্ত করেছেন। এ সংক্রান্ত দু'টি অনুচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য দাবি করে "ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে অস্তিত্বের অখণ্ডতা ও পূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এমন কিছু থেকে সমগ্র ব্যক্তির ও প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি" (১৯৭৪, ২৪)। বিশপ হিসেবে, "আমাদের দায়িত্ব হল তার সম্পূর্ণ ও সমগ্র, দেহ ও মন, হৃদয় ও বিবেক, মন ও ইচ্ছাশক্তিসহ মানব ব্যক্তিকে সংরক্ষণ ও উত্তোলন করা, আর এমন কাজ করার মধ্য দিয়ে, মানব সমাজকে নবায়িত করা" (১৯৭৬, ৪১)।

মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য সর্বোপরি দাবি করে কাঠামোগত মুক্তি। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ পাপের এবং অন্যায্য সামাজিক কাঠামোর সামাজিক দিক সম্পর্কে বলেছেন। "আজকে আমরা পাপময় কাঠামোগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছি। নিপীড়নের শুধুমাত্র একক মন্দ দৃষ্টান্ত নয়, কিন্তু আরও রয়েছে মন্দ প্রভাব এবং সমাজের অনেক কাঠামো যেগুলোর অন্যায্যতার জন্ম দেয়। এমনকি একজন সদ্ ব্যক্তি, দুর্নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে, অসৎ হওয়ার প্রলোভনকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন মনে করে।" কাজেই, "এ ধরনের কাঠামোগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য" আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে (৮৪)।

বিপশগণ আরও উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তিগণ অনেক "অন্যায্য কাঠামোসমূহের শিকার। এ সকল কাঠামো নিরাময়ের সব ধরনের উপায়ের খোঁজ করার লক্ষ্যে ন্যায্য সমাজের জন্য সংগ্রাম করা খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণের দায়িত্ব। 'মণ্ডলী নিঃসন্দেহে মনে করে, এমন সব সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আরও মানবিক, আরও ন্যায়সঙ্গত, ব্যক্তি-অধিকারের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল এবং আরও শোষণমুক্ত ও দাসত্বমুক্ত' (খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার, ৩৬)" (৫২)।

৭। দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকার।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান ১-এর উল্লেখ কন্বরে, বিশপগণ ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বলেন: "আমাদের জন্য যদি কোন বিশেষ দল থেকে থাকে যার আনন্দ-আশা, শোক-উৎকণ্ঠা, বিশেষ করে আমাদের নিজেদের আনন্দ-আশা, শোক-উৎকণ্ঠা, তাহলে সেটি হচ্ছে দরিদ্র, নিপীড়িত, কষ্টভোগী এবং যারা আধুনিক সভ্যতার চাপে হাজারোভাবে আক্রান্ত তাদের দল" (৪১)। সেবক হিসেবে, খ্রীষ্টমণ্ডলীকে অবশ্যই এ ভ্রান্ত ধারণা ঘোচাতে হবে যে, "সে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীগুলোর স্বার্থগুলোর সঙ্গে যুক্ত আর এগুলোর উন্নতিতে সহায়তা করে" (১৯৭৪, ৩০)।

বিশপগণের বিভিন্ন বিবৃতির কেন্দ্রিয় বিষয় হচ্ছে, দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ভালবাসা। আমাদের আদর্শস্বরূপ খ্রীষ্ট দরিদ্রদের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজেকে তিনি তাদের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সুতরাং, সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলী অবশ্যই নিজেকে শোষণ ও নিপীড়নের সব ধরনের পরিস্থিতি থেকে দরিদ্রদের মুক্তিকর্মে নিয়োজিত করবে। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো এই অগ্রাধিকারভিত্তিক ভালবাসা বাস্তবায়িত করবে। বঞ্চিত ও নিপীড়িতদেরও প্রতি সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাদের ধর্মময় জীবন অবশ্যই মণ্ডলী ও সমাজের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের জন্য গতিশীল ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে। ধর্মপল্লী সমাজ নিজেই দরিদ্রদের জন্য অগ্রধিকারভিত্তিক ভালবাসাকে সকল প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সমগ্র মণ্ডলীকে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সঙ্গে সংলাপে নিয়োজিত হতে, তাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে, এবং তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে হবে।

৮। একটি অভিন্ন মানবসমাজ রচনা

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে বিশপগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে : "আজকে ভারত অপর যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তা হল একটি অভিন্ন মানবসমাজ রচনা প্রেম (ও) ন্যায্যতায় এক সূতোয় বাঁধা" (১০১)। সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি ও লক্ষ্য একই –এ ব্যাপারে অবগত হয়ে, মণ্ডলীকে একতা ও মিলনের উপায়স্বরূপ হয়ে উঠতে হবে। একটি জটিল প্রক্রিয়া হওয়ার দরুণ, একতা ও পুনর্মিলনকে ধীরে ধীরে একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ন্যায্যতা ও সমতাকে আলিঙ্গনকারী খাঁটি একতা আজকে দেশের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মণ্ডলীর উচিত হবে ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রেম ও ন্যায্যতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

৯। এক নতুন সমাজ গঠন

সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী যে নতুন বা উত্তম সমাজ গড়ে তুলতে চায় সে সংক্রান্ত ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর দর্শন কী ? এ সম্মিলনী এর আদর্শের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলেও, এটা আজকের পরিস্থিতির এর সমালোচনার মধ্য দিয়ে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে তার, সমাজের রূপান্তরসাধনের জন্য এর নীতিমালা ও প্রস্তাবনার, এবং সুসমাচার, ঐশরাজ্য ও খোদ নতুন সমাজের ক্ষেত্রে এটা যেসব মূল্যবোধ আরোপ করে সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সাধারণ নীতিমালা ও মূল্যবোধের স্তরে রয়ে গেলেও এ সম্মিলনীর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সার্বিক ও বোধগম্য।

বিশপগণ বর্তমান পরিস্থিতির এবং বিভিন্ন নীতিমালা ও কাঠামোর অনেক সমালোচনাধর্মী। প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা জুড়ে তারা সমাজের এবং এর কাঠামো/স্থাপনাসমূহের পরিবর্তন/রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে, তারা এমনকি যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন ন্যায্যতা, প্রেম, সমৃদ্ধি ও শান্তির এক নতুন ভারত রচনায় অহিংস সামাজিক আন্দোলনের উন্মোষ ঘটানোর জন্য। বিশপগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা দেশের সম্পদের এবং উন্নয়নের সুফলের সম/সুষম বণ্টনের আর সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর অংশগ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া, তারা বিরোধিতা করেছেন বর্ণ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার এবং বিভিন্ন ধরনের বৈসাদৃশ্য, অন্যায্যতা ও বৈষম্যের, যেগুলোর সচরাচর শিকার দলিত, উপজাতি, নারী, শ্রমিক, শিশু, সংখ্যালঘু, আর একই ভাবে কিছু কিছু সমাজকর্মী।

বিশপগণ সর্বোপরি এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন মূল্যবোধের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। তারা এ কাজটি প্রধানত করেছেন যখন তারা ঐশরাজ্য এবং সুসমাচার/মঙ্গলসমাচার সম্পর্কে বলেছেন – ঐশরাজ্য এবং সুসমাচার/মঙ্গলসমাচার হচ্ছে দু'টি কেন্দ্রিয় মূলভাবনা, যেগুলির কথা তারা ২০ বার এবং ৬০ বার উল্লেখ করেছেন। বিশপগণ ঘোষণা করেছেন যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর দায়িত্ব সুসমাচারের মূল্যবোধগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং এই জগতে ঐশরাজ্যের বাস্তবায়ন করা এবং এই লক্ষ্যেই ঈশ্বর সকল মানুষকে আহ্বান করে থাকেন। মণ্ডলী হচ্ছে, এই জগতে ঐশরাজ্যের বীজ এবং মূর্তপ্রকাশ। যে সকল মূল্যবোধের কথা বিশপগণ প্রায়শই উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল প্রেম, সহভাগিতা, ন্যায্যতা, মানব মর্যাদা (ও মানবাধিকার), একতা, ভ্রাতৃত্ব ও মিলন, সহিষ্ণুতা, পুনর্মিলন, বৈষম্যহীনতা, অংশগ্রহণ, স্বাধীনতা, জীবনের পূর্ণতা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায্যতাকে উল্লেখ করা হয়েছে ঐশরাজ্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে।

আরও অনেক অনুচ্ছেদে, বিশপগণ উত্তম/ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থা, একটি খাঁটি/নতুন সমাজ, প্রেমের সংস্কৃতি, এবং প্রেম ও ন্যায্যতার সংস্কৃতি সম্পর্কেও বলেছেন। তারা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে, উদাহরণস্বরূপ, একটি ন্যায়, মানবীয়, অংশগ্রহণধর্মী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য ধর্মের ভাই ও বোনদের সঙ্গে এবং ন্যায্যতা, প্রেম, শান্তি ও ঐক্যের উপর অর্থাৎ প্রেমের সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের হাতে হাত মেলানোর কথা বলেছেন। এ সবই বিশপগণের স্বপ্নানুসারে নতুন সমাজ ব্যবস্থার একটি সাধারণ চিত্র সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা যোগায়।

১০। মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট

ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর বিভিন্ন বিবৃতি এটার উপর জোর দেয় যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সমগ্র প্রেরণদায়িত্ব খ্রীষ্টের দ্বারা ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ দায়িত্ব আসে খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। এ কারণে খ্রীষ্টকে প্রধানত উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি ঈশ্বর ও সকলকে ভালবাসেন হিসেবে, আর ঐশরাজ্য এবং সুসমাচার ও এর মূল্যবোধসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। তাঁকে আরও তুলে ধরা হয়েছে মানব-ঈশ্বর (ঈশ্বরকে প্রকাশকারী ও প্রেরণকর্মী), মানব আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, মানবতার সেবক যিনি মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে দরিদ্রদের সঙ্গে একাত্মতায় রয়েছেন, অধিকারবঞ্চিত ও সমাজচ্যুতদের বন্ধু, জাতিগণের আলো, পৃথিবীর লবন, পরম পথ, সত্য ও জীবন, গুরু ও মেষপালক, মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা, নতুন মানুষ ও সৃষ্টি, নতুন মানবতার প্রতিরূপ, ইত্যাদি ইত্যাদি হিসেবে। যথেষ্ট অবাক লাগে যে, ধারণার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টকে সরাসরি মুক্তিদাতা বা যিনি মুক্ত করেন ব'লে উল্লেখ করা হয়নি। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণকে গণ্য করা হয়েছে অনুগামী, শিষ্য, সাক্ষী, খ্রীষ্টের প্রেরিতদূত হিসেবে, এবং এমন জাতি হিসেবে যারা তাঁর জীবন সহভাগিতা করে এবং তাঁর দ্বারা ও তাঁর আশ্রয়ে বসবাস করে।

বিশপগণের খ্রীষ্ট-ধারণাকে আরও ভালমত বুঝতে তাদের কিছু বিবৃতি আমাদের সাহায্য করতে পারে। যীশু এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, তিনি "ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত" আর "তাঁর কাজ করছেন" (যোহন ৪:২৪)। "তাঁর মানব উপস্থিতিই ছিল... বৈশিষ্ট্যে প্রেরণধর্মী"। যীশু এসেছিলেন সেবা পেতে নয় কিন্তু সেবা করতে। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কালের সমাজচ্যুতদের বন্ধু আর তাদের সঙ্গে তিনি স্বাধীনভাবে মেলামেশা করেছেন। তিনি নিজেকে বিশেষ উপায়ে দরিদ্রদের সঙ্গে এবং বাক্‌হীনদের সঙ্গে এক করেছেন। খ্রীষ্ট ছিলেন সকলের জন্য আর লোকদের জন্যই তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি ছিলেন মানব হৃদয় আন্তরিকভাবে বাসনা করে এমন সবকিছুরই উত্তর। তিনি তাঁর সময়কালের পালেস্টাইনের সংস্কৃতি ও ইতিহাসে নিজেকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। তিনি এসেছিলেন জীবনের পরিপূর্ণতা দান করতে, "যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরিভাবেই তা পায়" (যোহন ১০:১০)। তিনি লোকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের অবস্থায় ছিলেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের দিগন্ত ও পথ উভয়।

বিশপগণের খ্রীষ্ট বিষয়ক সর্বাপেক্ষা সর্বাত্মক ও সামাজিক দিক থেকে অনুপ্রেরণাধর্মী বিবৃতি সম্ভবত ছিল ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে করা বিবৃতি। তারা ঘোষণা করেন যে, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার শিকড়গুলো নিহিত আছে যীশুর নিজের পরিত্রাণদায়ী সেবাকার্যে। যীশু তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী ঘোষণা করেছেন যে, জগতে ও জনগণের মধ্যে ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটছে। তিনি দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করেছেন, বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছেন, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর পদদলিত মানুষকে মুক্ত করেছেন (দ্র: লুক ৪:১৮-১৯)। তিনি দীনদরিদ্র ও পদদলিতদের সঙ্গ দিয়েছেন।

তাঁর সেবাকাজের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র তাদের পাপময় অবস্থা থেকে লোকদের মুক্ত করে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের পুনর্মিলিত করা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান-সন্ততিদের ন্যায় মানব জীবন অতিহবাহিত করার লক্ষ্যে তাদের যোগ্য করে তোলাও। তাঁর পরিত্রাণকর্মের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত মানব জীবনের সর্বাঙ্গীনতার লক্ষ্যে যত অমানবীয় অবস্থা এবং অন্যায্য যত কাঠামোর শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তি। ঐশরাজ্য... হচ্ছে সার্বজনীন প্রেম, মিলন ও সহভাগিতা এবং এটা অবশ্যই নিজেকে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধগুলো অনুসারে একটি সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের মধ্যে প্রকাশ করবে। এ বিবৃতি ঐশরাজ্যের এবং সুসমাচারের ঘোষণা হিসেবে মণ্ডলীর মঙ্গলবাণী ঘোষণার প্রেরণদায়িত্বের উপর আলোকপাত করে।

উপসংহার

সাম্প্রতিক এক বাইবেল অধ্যয়নে, যোসেফ পাথ্রাপাঙ্কাল এই বলে শেষ করেছেন যে, প্রেরণদায়িত্বের মঙ্গলসমাচার জ্ঞান ঐশরাজ্যের ঘোষণার উপর এবং লোকদের জন্য, বিশেষ করে দীনদরিদ্র ও পদদলিতদের জন্য নিরাময়, শান্তি ও ন্যায্যতার আনয়নের উপর আলোকপাত করে। আজকের ঐশতত্ত্ববিদগণ মুখোমুখি হন সম্পূর্ণরূপে নতুন নতুন বিষয়ের, যেমন দরিদ্রতা, দীনতা ও বিশ্বায়নের আধুনিক যত সমস্যা, আর ধর্মীয়

বহুত্ববাদ ও সন্ত্রাসবাদের চ্যালেঞ্জের। কাজেই, মঙ্গলসমাচারকে অবশ্যই বর্তমান বাস্তবতা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে হবে। খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যদান, ঐশরাজ্য ও এর মূল্যবোধসমূহের ঘোষণা, ন্যায্যতা, শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি আত্মোনিয়োজন, বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের, সংস্কৃত্যায়নের, আন্তসংস্কৃতির লোকদের মধ্যে সংলাপ, এবং পৃথিবী নামক গ্রহের পরিবেশগত ভাবনার প্রতি মনোযোগদান এগুলো সবই আমাদের যুগের জন্য একটি সুসম্পূর্ণ প্রেরণ ঐশতত্ত্বের বিভিন্ন মানদণ্ডের আওতাভুক্ত বলে মনে হয়। এ সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্নে, খ্রীষ্টমণ্ডলীকে দাসের ভূমিকা পালন করতে হবে।

একইভাবে যোসেফ মাত্তম লক্ষ্য করেছেন, যীশুর 'দেওয়াল ভাঙ্গা' সেবাকাজ ধর্মীয় সহযোগিতার উপর নয়, কিন্তু মানব চাহিদা ও সমস্যার প্রতি সাড়াদানের, সকল মানব চ্যালেঞ্জের চারপাশ লোকদের ঐক্যবদ্ধকরণের এবং রূপান্তরধর্মী মূল্যবোধ ও সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছে। যীশুর প্রেরণদায়িত্ব ছিল লোকদের পৃথক জাতি হিসেবে গড়ে তোলা, তারা যে ভাই-বোন, একই পিতা/ মাতার সন্তানসন্ততি, সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করে তোলা... আমাদের কাজ হল প্রেমের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা, বিভেদ, স্বার্থপরতা ও ঘৃণার সকল প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা।

এম.এ. দেবাসিয়ার মতে, খ্রীষ্টমণ্ডলী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো অবশ্যই তাদের মূল চেতনাকে মানব কল্যাণ ও ন্যায্যতার বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করবে আর একসাথে মিলে গড়ে তুলবে একটি বহুত্ববাদী এবং সামাজিক দিক থেকে সম্মিলিত একটি মানব সমাজ। এমন কাজ দাবি করে সমসাময়িক সমাজের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি সাড়াদান, যেমন প্রাচুর্যতার মাঝেও প্রকট দরিদ্রতা; সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদের হুমকি; নারী, শিশু, দলিত, সংখ্যালঘু ও উপজাতিদের নিপীড়ন ও তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা; বিশ্বায়নের মনুষ্যত্বহীন নানা প্রভাব, পরিবেশ বিপর্যয়।

পরিশেষে, ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনী প্রস্তাব করে আমাদের একসাথে মিলে গড়ে তুলতে হবে এ রকম এক নতুন জগত ব্যবস্থার একটি প্রাসঙ্গিক ও অনুপ্রেরণাধর্মী দর্শনের, প্রস্তাব করে একটি প্রাসঙ্গিক সুসমাচারের, যা আজকের পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেয়। এর মুখ্য দিকগুলো এগুলোর উপর আলোকপাত করে : উন্নয়ন, ন্যায্যতা, সমতা, অংশগ্রহণ, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, শান্তি ও মানবাধিকার। দর্শনটির লক্ষ্য হল, সাধারণ মঙ্গল তবে দীনদরিদ্রদের প্রতি বিশেষ মনোযোগদানের মাধ্যমে। এর সাথে জড়িত যা-কিছু অমানবীয় ও শোষণধর্মী তা থেকে মুক্তি এবং অন্তরতম ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, সর্বক্ষেত্রে এর নানা মূল্যবোধ, ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, নীতিমালা, কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের আমূল পরিবর্তন।

এ দর্শনের ভাবনার বিষয় শুধুমাত্র খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ ও খ্রীষ্টমণ্ডলী নয়, কিন্তু সকল মানুষ ও সমাজ। এটা প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন। বাস্তবিকপক্ষে, অনেক নেতা, বিদ্বান ও সমাজকর্মী জগতের জন্য মোটামুটি একই রকম দর্শনের প্রস্তাব করেন, এমনকি অনেক সময় তা বিস্তারিতভাবে প্রস্তাব করেন। স্থান সংকুলানের কারণে এ দুটি দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন সম্ভব হল না। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার জন্য যা সুনির্দিষ্ট তা হল, বিশপগণ জোর দিয়েছেন যেন সামাজিক সুসমাচার ঐশ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আর তারা এটা খ্রীষ্টীয় ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। হিন্দু, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের পক্ষে তাদের ধর্মানুসারীদের ও অন্যান্য সকল মানুষের জন্য একটি অনুরূপ সামাজিক শিক্ষার ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনা এখনো বাকি রয়েছে। এ কাজটি তারা যত তাড়াতাড়ি করবে তত মঙ্গল।

আন্তর্জাতিক ঘোষণাসমূহ

১৯৪৮ : মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা

১৯৫০ : মানবাধিকারের উপর ইউরোপীয়দের কনভেনশন

১৯৫১ : নর-নারীদের সম-মজুরী প্রদান বিষয়ক কনভেনশন

১৯৫২ : নারীদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কনভেনশন

১৯৫৩ : দাস প্রথা বিলুপ্তকরণ বিষয়ক কনভেনশন

১৯৫৯ : শিশুদের অধিকার ঘোষণা

১৯৫৯ : কাজ ও পেশার বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক কনভেনশন

১৯৬০ : ঔপনিবেশিক দেশসমূহের স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৬১ : ইউরোপীয় সামাজিক চার্ট

১৯৬৯ : মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন

১৯৭৬ : জনগণের অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (আলজেরী চার্ট)

১৯৮১ : মানবাধিকার বিষয়ক ইসলামী ঘোষণা